Vol. 53 | No. 3 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনাভাবনা

Volume	53
Issue	3
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জাবেদ ইকবাল
Published online	June 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i3.11
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i3.11
Pages	১৮৫-২০৩
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৩ ॥ সংখ্যা : ৩ ॥ জুন ২০১৬

প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনাভাবনা

জাবেদ ইকবাল*

সার-সংক্ষেপ : প্রমথ চৌধুরী বাংলা সাহিত্যে প্রধানত পরিচিত একজন পত্রিকা সম্পাদক, চলিত ভাষারীতির প্রবর্তক, সমালোচক ও সাহিত্যতাত্ত্বিক হিসেবে। ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সভ্যতা, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, চিরন্তন ও সাময়িক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। নানা জ্ঞান ও বিদ্যার অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ তিনি করেছেন একেবারে সহজ ঘরোয়া কথায়। *প্রবন্ধসংগ্রহ*-র বিভিন্ন প্রবন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে রয়েছে সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কে তাঁর ভাবনা। সে ভাবনায় তিনি সংস্কারের অন্ধতা ও মোহের পিছুটান থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসী, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র (sensual) না হলেও ইন্দ্রিয়বাদী (sensuous), বিবর্তনপন্থী, সর্বপ্রকার জড়তা-স্থিরতা-শিথিলতা-নিশ্চেষ্টতার বিরোধী; সুরুচিপন্থী ও সুন্দরের পূজারী। তাঁর সমালোচনা ভাবনার মূল কথা সাহিত্যের মুক্তি। এই মুক্তি প্রাচীন ও নবীন সংস্কারের অন্ধতা থেকে মুক্তি, অর্থহীন বন্ধন থেকে মুক্তি, গতানুগতিকতা হতে মুক্তি, বুদ্ধির মুক্তি ও ভাবালুতামুক্তি। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর সমালোচনা-ভাবনার এই বৈশিষ্ট্যসমূহ উন্মোচনের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে 'বীরবল' ছদ্মনামে পরিচিত প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮–১৯৪৬) ছিলেন একাধারে কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, চলিত ভাষারীতির প্রবর্তক, সাহিত্যতাত্ত্বিক, মননশীল লেখক এবং সাহিত্য সমালোচক। তিনি নব্যধারার সাহিত্যের অগ্রপথিক এবং বুদ্ধির দীপ্তিতে, রুচিতে ও মানসপ্রকর্ষে অনন্য। বাংলা সাহিত্যে তিনি 'বিলেতফেরত সাহিত্যিক'; রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভিহিত করতে চেয়েছিলেন 'বাংলা সাহিত্যের চালক' হিসেবে। তাঁর লেখনীর স্পর্শে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য হয়েছে উন্নত, সমৃদ্ধ, পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও বিশ্বমান-উত্তীর্ণ। ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীতসহ নানা বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধে আমরা যুক্তিবাদিতা, পাণ্ডিত্য এবং তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতধর্মী বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাই। 'সজল হৃদয়বৃত্তি নয়, তী

*জাবেদ ইকবাল, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, নটর ডেম কলেজ, ঢাকা।

ও উজ্জ্বল বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে তিনি পৃথিবীকে, মানুষকে ও মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে দেখেছেন, বিচার করেছেন।' (জীবেন্দ্র ২০০২ : ৩৯) দুই শতকের সাহিত্যাদর্শ ও সাহিত্যরীতির সম্মিলন ঘটেছে তাঁর জীবন ও সাহিত্যে। রবীন্দ্রনাথের পরে তিনিই একমাত্র প্রাবন্ধিক যাঁর প্রভাব 'আধুনিক বাংলা প্রবন্ধে পড়েছে সবচেয়ে বেশি।' (রথীন্দ্রনাথ, ১৯৫৮ : ১৪৪০) প্রবন্ধে তিনি 'নানা জ্ঞান ও বিদ্যার অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ করেছেন যেন সহজ ঘরোয়া কথায়। যা প্রাচীন, সুতরাং নমস্য ও তর্কাতীত, বর্তমানের আলো ফেলে তার স্বরূপ প্রকাশ করেছেন। যা আধুনিক ও সাময়িক, অতিপ্রাচীনের মধ্যে তার ছবি আবিষ্কার ক'রে মানুষের মন ও চরিত্রের মূল ঐক্য দেখিয়েছেন। আর, সকল আলোচনাকে অনুস্যূত করে আছে এক দীপ্তিমান রসিকতার সুতীক্ষ্ণ সরসতা।' (অতুল, ১৯৮৬ : ১২-১৩)

প্রমথ চৌধুরী বিচিত্র বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলোতে 'বিষয়বৈচিত্র্যের অবধি নেই। ভাষা সাহিত্য, শিক্ষা সভ্যতা, প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাস, সমাজ পলিটিক্স, চিরন্তন ও সাময়িক সকলের সেখানে স্থান।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ১২) সেখানে তিনি নানা জ্ঞান ও বিদ্যার অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ করেছেন যেন একেবারে সহজভাবে ঘরোয়া কথায়। তাঁর *প্রবন্ধসংগ্রহ*-র প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর সাহিত্য সমালোচনাভাবনা। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে মূলত সাহিত্যসমালোচক হিসেবেই। *প্রবন্ধসংগ্রহ*-র প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ অবলম্বনে তাঁর সাহিত্য-সমালোচক সত্তার বৈশিষ্ট্য নিরূপণই আমাদের অন্বিষ্ট। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরা তাঁর সমালোচনা ভাবনার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য উন্মোচনে সচেষ্ট হবো।

প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনাভাবনা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে সমালোচনা বলতে মূলত কী বোঝায় এতৎসম্পর্কিত আলোচনা আবশ্যক বলে বিবেচনা করি। সাধারণত সমালোচনা বলতে আমরা বুঝি শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা যা ইংরেজি Criticism শব্দের বাংলা পরিভাষা। সমালোচনা শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো – ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রদর্শনপূর্বক আলোচনা বা শিল্প/সাহিত্যের দোষ-গুণের রসজ্ঞ আলোচনা; যার সাহায্যে সাহিত্যকর্মের শ্রেণিকরণ, ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন করা হয়।

সমালোচনা বলতে প্রমথ চৌধুরীর কী বুঝিয়েছেন তার স্বরূপ নির্দেশের পূর্বে তাঁর সমালোচক হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর্যায়ক্রম এবং সমালোচক-সত্তার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ আবশ্যক। প্রমথ চৌধুরীর পৈতৃকভিটা পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে, জন্মস্থান যশোরে, মানসগঠন ও ভাষা কৃষ্ণনগরের এবং সাধনপীঠ কলকাতায়। তাঁর মানস-গঠনে জন্মভূমি যশোর কোনো প্রভাব না ফেললেও কৃষ্ণনগরের প্রভাব সেখানে অনন্য ও স্বতন্ত্র। তাঁর রূপ-রস-চেতনার উন্মেষ কৃষ্ণনগরেই। কৃষ্ণনগরই তাঁর সাংস্কৃতিক

জীবনের পটভূমিকা রচনা করেছে; তাঁকে দিয়েছে ভাষা ও রূপজ্ঞানের মোহনমন্ত্র। এ কারণে বারবার তিনি নিজেকে 'কৃষ্ণনাগরিক' বলে পরিচয় দিয়েছেন। কৃষ্ণনগরের নানা শ্রেণির মানুষের মুখের ভাষা ছিল তাঁর ভাষাশিক্ষার মূলে।

অতি অল্প বয়সেই বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যপাঠের পাশাপাশি বিদেশি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। নিজেদের বাড়িতেই বিদেশি সাহিত্যপাঠের আবহ ছিলো। তাঁর পিতা ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং বাড়িতেই ইংরেজি বইয়ের বিরাট এক লাইব্রেরি ছিল। বইপড়া ও বইকেনার স্বভাব তাঁর সেখান থেকেই গড়ে ওঠে। তাঁর ভাইয়েরা সকলেই ছিলেন কৃতবিদ্য। লাইব্রেরির আবহাওয়ায় তিনি মানুষ হয়েছেন আর ইংরেজি নভেল পড়ার দীক্ষা পেয়েছেন সেজদাদা কুমুদনাথের কাছ থেকে। তাঁর মনোজীবনের ওপর সাহিত্যের সাত সমুদ্রের আলো ছড়িয়ে পড়ে যখন বড়দাদা আশুতোষ চৌধুরী ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে বিলেত হতে দেশে ফিরে আসেন। আশুতোষ চৌধুরীর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে। সেই সূত্র ধরেই তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ফরাসি সাহিত্য পাঠে তাঁর হাতেখড়িও হয় এই সময় থেকে।

তাঁর মানসগঠনের ক্ষেত্রে এই অধ্যায়টি অত্যন্ত মূল্যবান। এই সময়ে তাঁর পরিচয় হয় ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে, বিশেষ করে প্রি-র‍্যাফালাইট কবিদের কবিতা, প্রি-র‍্যাফালাইট শিল্প, রসেটি ও সুইনবার্নের কবিতা, ভলতেয়ার, মোলিয়ের, ফ্লবেয়ার ও মতেইনের রচনার সঙ্গে। ফলে ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর মনে বিশেষ অনুরাগ তৈরি হয় এবং এইসূত্রেই বন্ধুত্ব হয় সত্যেন্দ্রনাথ সিংহ, লোকেন্দ্রনাথ পালিত ও প্রিয়নাথ সেন প্রমুখের সঙ্গে। এঁরা সকলেই ছিলেন তাঁর চেয়ে বয়সে বড় এবং ফরাসি সাহিত্যরসিক। এই কালেই তিনি ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। রবীন্দ্র-প্রতিভার সর্বগ্রাসী আকর্ষণ দ্বারা তিনি কিছুটা প্রভাবিতও হন। *বাল্মীকি প্রতিভা* গীতিনাট্যটির স্মৃতি তাঁর মনে দারুণভাবে রেখাপাত করে। ঠাকুর পরিবারের সঙ্গীতরসিক আবহাওয়া তাঁর সঙ্গীতমুগ্ধ মনটিকে পুষ্ট করে। তিনি অতীন্দ্রিয়পন্থী ছিলেন না। যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও প্রত্যক্ষগোচর তাকেই তিনি রূপ বলে স্বীকার করেছেন। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপজ্ঞান ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আরও প্রখর হয়। তরুণবয়সে কবিতা সম্পর্কে তাঁর মনোজগৎ রবীন্দ্রনাথ দ্বারা প্রভাবিত হলেও সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি মূলত রবীন্দ্রনাথের বিপরীত মার্গের সাধক। হৃদয়াবেগবর্জিত বুদ্ধিদীপ্ত বাণীবিন্যাসের তিনি কুশলী শিল্পী। স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার চেয়ে সযত্ন কলাকৃতির ওপরেই তিনি নির্ভরশীল। তাঁর মার্জিতবুদ্ধি ও বিদগ্ধমন যে অভিজাত রুচি ও মানসিকতার লালন চেয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চলন, বলন ও রুচির দ্বারা নিঃসন্দেহে সে পিপাসা মিটেছিল।

তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণার স্বরূপ ছিল বিচিত্র। এম. এ. পাশ করার পর তিনি সংস্কৃত ও ইতালীয় ভাষা চর্চা শুরু করেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি পল্লবগ্রাহী ছিলেন না। সব কিছুর মূলে প্রবেশ করার জন্যে তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ। সাহিত্যের পাশাপাশি দর্শন ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর চিন্তার মৌলিকতা, মননশীলতা, রচনারীতির পরিচ্ছন্নতা, প্রকাশনিপুণতা ও নিজস্ব চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটেছিল। পরবর্তীকালের সাহিত্যিক জীবনে এর সবই পূর্ণতররূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্য সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলো পাঠ করলে দেখা যাবে যে, মূল্যায়িত বিষয়ের পুনর্মূল্যায়নে তিনি ছিলেন বিশেষ আগ্রহী।

তাঁর মানসগঠনের সাথে ফরাসি অভিজাত সমাজমানসের সাদৃশ্য রয়েছে। ধরাবাঁধা চাকুরিজীবনকে তিনি পছন্দ করতেন না। ফলে পঠন-পাঠনের মাধ্যমে মনকে পরিণত করে তোলার মতো উপযুক্ত অবসর তিনি পেয়েছিলেন। সমালোচকের মতে,

> কৃষ্ণনগরের ভাষা, ঠাকুর পরিবারের বিদগ্ধ পরিবেশ, বিলেত-ফেরৎ সাহিত্য-রসিকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, বই কেনা ও বই পড়া তাঁর মনকে ও রুচিকে তৈরি করেছিলো। তাঁর রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অর্থ দেশ-বিদেশের নানা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। (রথীন্দ্রনাথ, ১৯৫৮ : ১০)

তাঁর প্রবন্ধগুলোর মধ্যে নানাপ্রসঙ্গের উল্লেখ থেকে তাঁর বহু শাখায়িত পঠনশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি পরিণত মন নিয়ে কলম ধরেছিলেন, তাই তাঁর লেখায় কাঁচা হাতের ছাপ নেই বললেই চলে। তিনি সাহিত্যিক শুচিবাই ত্যাগ করলেও অভিজাত রুচিকে পরিত্যাগ করেননি। তাঁর সাহিত্যিক মানদণ্ড ও আদর্শ ছিল অতি উচ্চশ্রেণির। সবুজপত্র পত্রিকায় জ্ঞানমার্গ ও বুদ্ধিমার্গের যে দীপ্ত হোমানল তিনি জ্বালিয়েছিলেন, তাঁর সুকর্ষিত মনোজীবন ছিলো তার নির্ধূম বহ্নি। মানসগঠনগত দিক থেকে তিনি হচ্ছেন সেই রসরুচির প্রতিভূ ইংরেজিতে যাকে বলে 'Aesthetic sense'। সমালোচকের মতে,

> বিরাট লাইব্রেরি, প্রচুর অবকাশ, নতুন বই কেনা ও পড়ার অনলস আগ্রহ, ব্যক্তিত্বে ও মানসিকতায় বাদশাহী আভিজাত্য, আলাপে আচরণে স্বকীয়তা সব কিছু মিলিয়ে তাঁর উপস্থিতি বিস্ময়কর। পড়েছেন বহু, লিখেছেন তার তুলনায় নিতান্তই অল্প। অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে কলম ধরেছেন, কিন্তু সিদ্ধি লাভ করতে মোটেই দেরি হয় নি। পরিণত মন নিয়েই সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি দেখা দিয়েছিলেন – ধূমকেতু নয়, ধ্রুবতারা হিসেবেই। (রথীন্দ্রনাথ, ১৯৫৮ : ২)

ইংরেজ সাহিত্যিকদের মধ্যে জি. কে. চেস্টারটন, জর্জ বার্নার্ড শ ও ম্যাক্স বিয়ারবমের প্রভাব প্রমথ চৌধুরীর ওপর রয়েছে। চেস্টারটনের রচনারীতির সঙ্গে তাঁর রচনারীতির কিছু কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর গল্প ও প্রবন্ধগুলোর মধ্যে বার্নার্ড শ সুলভ দীর্ঘ ভূমিকা সংযোজনের বৈশিষ্ট্যও লক্ষ করা যায়। আইরিশ লেখক অস্কার

ওয়াইল্ডের তীক্ষ্ণাগ্র মন্তব্য ও প্যারাডক্স-প্রবণতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রবন্ধে। সমালোচকের মতে,

> শ', চেষ্টারটন বা বিয়ারবম – এই তিনজন খ্যাতকীর্তি লেখকের মানস-প্রকর্ষের ছাপ তাঁর ওপরে প'ড়েছিল মাত্র, কিন্তু কতকগুলি বিশেষ জায়গা ছাড়া তাঁর রচনাকে অন্ততঃ এ তিনজনের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অগভীর ও ভঙ্গিপ্রধান বলেই মনে হয়। (রথীন্দ্রনাথ, ১৯৫৮ : ৭৫-৭৬)

এর কারণ প্রমথ চৌধুরীকে বাংলা সাহিত্যের অনভ্যস্ত মাটিতে নতুন ধরনের ফসল ফলাতে হয়েছিল। আর এঁদের তুলনায় তাঁর মানস-পরিধি ছিল অনেকখানি সংকীর্ণ। তারপরেও প্রমথ চৌধুরীর মনোজীবনের বলিষ্ঠতা কম নয়। 'তিনি বাংলা গদ্যের গীতিগন্ধী ও মন্থরগতি সুকুমার ধারাটির সঙ্গে শেভিয়ান ভ্রূভঙ্গি মেলাতে চেয়েছিলেন, চেষ্টারটনীয় দীপ্তি আনতে চেয়েছিলেন, আর চেয়েছিলেন সুদীর্ঘ পাঁচশো বছরের বহু কর্ষণায় গড়ে ওঠা ফরাসী গদ্যের মেজাজ আনতে।' (রথীন্দ্রনাথ, ১৯৫৮ : ৭৬)

প্রমথ চৌধুরী সমালোচনা শব্দটির পরিবর্তে আলোচনা শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। তবে তিনি আলোচনা শব্দটিকে ইংরেজি Criticism শব্দটির ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ বলে মনে করেন না। এক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) মতানুবর্তী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সমালোচনার পরিবর্তে আলোচনা শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী বিশ্বাস করেন না যে, "সম' উপসর্গটির বিশেষ কোন অর্থবাচকতা আছে।" (প্রমথ, ১৯৮৯ : ৪৪৫) তিনি মনে করেন, 'সমালোচনা কথাটা আমরা যে অর্থে ব্যবহার করি, তার আসল অর্থ ঠিক তা না।' (প্রমথ, ১৯৮৯ : ৪৪৬) তাঁর দৃষ্টিতে, "আলোচনা মানে 'আ' অর্থাৎ বিশেষ রূপে লোচন অর্থাৎ ঈক্ষণ। যে বিষয়ে সন্দেহ হয় তার সন্দেহভঞ্জন করার জন্যে বিশেষরূপে সেটিকে লক্ষ্য করে দেখবার নামই আলোচনা।" (প্রমথ, ১৯৮৯ : ৪৪৬) তিনি আরও বলেন, 'আলোচনা ইংরেজি scrutinize শব্দের যথার্থ প্রতিবাক্য। ক্রিটিসিজম শব্দের ঠিক যথার্থ প্রতিবাক্য বাংলা কিংবা সংস্কৃত ভাষায় না থাকলেও 'বিচার' শব্দটি অনেক পরিমাণে সেই অর্থ প্রকাশ করে।' (প্রমথ, ১৯৮৯ : ৪৪৬) "কিন্তু সমালোচনার পরিবর্তে 'বিচার' যে বাঙালি সমালোচকদের কাছে গ্রাহ্য হবে, এ আশা আমি রাখি নে। কারণ, এদের উদ্দেশ্য বিচার নয়, প্রচার করা"। (প্রমথ, ১৯৮৯ : ৪৪৬)

তিনি মনে করেন, 'কোন কাব্যে কি আছে তাই আবিষ্কার করা এবং প্রকাশ করাই হচ্ছে সমালোচনার, শুধু মুখ্য নয়, একমাত্র উদ্দেশ্য।' (প্রমথ, ১৯৮৯ : ৬০) এবং 'রূপের বিচার করাই সমালোচকদের একমাত্র কর্তব্য।' (প্রমথ, ১৯৮৯ : ২২৬) এ কারণে তাঁর দৃষ্টিতে 'সমালোচকদের ভাষ্যকার না হয়ে সূত্রকার হওয়াই সঙ্গত। তাঁরা যদি কোন নব্য গ্রন্থের খেই ধরিয়ে দেন তা হলেই আমরা পাঠকবর্গ যথেষ্ট মনে করি'

(প্রমথ, ১৯৮৯ : ৪৪৩) তাছাড়া 'বাড়াবাড়ি জিনিসটা সবক্ষেত্রেই ইতরতার পরিচায়ক।' (প্রমথ, ১৯৮৯ : ৪৪৫) তাঁর মতে,'সমালোচনার কার্য লৌকিক নিন্দা-প্রশংসা নয়, এর অমরতার কারণ আবিষ্কার করা; কিন্তু তা করতে গেলে মনকে রাগ-দ্বেষ মুক্ত করতে হয়।' (প্রমথ, ১৯৮৯ : ২০৯)। অর্থাৎ সমালোচকদের উচিত মনকে বিদ্বেষমুক্ত করে সাহিত্য বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া।

প্রমথ চৌধুরীর মতে, যুগধর্মানুসারে সাহিত্য-সমালোচনাও বিজ্ঞান। তাই সমালোচকদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হওয়া উচিত। সমালোচকেরা যখন সাহিত্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে কোনো সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত প্রকৃতি ও চরিত্রের আলোচনা করতে বসেন, তখন প্রায়ই তা আক্ষেপের বিষয় হয়; কারণ কোনো লেখকের লেখা থেকে তাঁর জীবনচরিত উদ্ধার করা যায় না। এ কারণে সমালোচকদের কর্তব্য হচ্ছে পাঠকদের কৌতূহল যথাসাধ্য চরিতার্থ করার জন্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা-প্রণোদিত সমালোচনা করা।

প্রমথ চৌধুরী ছিলেন জীবনীভিত্তিক সাহিত্য-সমালোচনার বিরোধী। তিনি মনে করতেন কবির বা সাহিত্যিকের জীবন পর্যালোচনা করে যথার্থ সাহিত্য-সমালোচনা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারা প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, 'কবিরে পাবে না তাঁহার জীবনচরিতে'। কবি ভারতচন্দ্রের জীবন আলোচনা করলে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই মন্তব্যের সত্যতা খুঁজে পাই। কবিতায় আমরা যে ভারতচন্দ্রকে পাই ভারতচন্দ্রের বাস্তব জীবনের সাথে তার কোনো সাদৃশ্য নেই। বাস্তব জীবনে ভারতচন্দ্রের নিজের চরিত্র ছিল অনন্যসাধারণ আত্মবশ। তাঁর সাংসারিক জীবন ছিল সত্যিই এক অসাধারণ ট্র্যাজেডি। কিন্তু তাঁর ঘোর দুঃখময় জীবনের ছায়া তাঁর কাব্যের গায়ে পড়েনি। তাই প্রমথ চৌধুরীর অভিমত :

> ভারতচন্দ্র ছোট হোন বড়ো হোন – জাতকবি; সুতরাং তাঁর অহংএর পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই। ভারতচন্দ্রের কাব্যের যথার্থ বিচার করতে হলে তিনি যে রাজার ছেলে এবং কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ, আর কৃষ্ণচন্দ্রের চরিত্র যে দূষিত এসব কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে হবে। (প্রমথ, ১৯৮৯ : ২১৫)

প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টিতে যথার্থ সমালোচক তিনিই যিনি সাহিত্যরসের যথার্থ রসিক। এ জাতীয় রসগ্রাহীরা জানেন যে, সাহিত্যের রস এক নয়, বহু এবং বিচিত্র। 'সুতরাং কোন লেখকের লেখায় কোন বিশেষ রস বা কোন বিশেষ গুণ ফুটে উঠেছে তাই যিনি ধরতে পারেন এবং পাঁচজনের কাছে ধরে দিতে পারেন, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ ক্রিটিক।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ২১৮)

প্রমথ চৌধুরী এটা মানেন যে, সমালোচনা জিনিসটা সাহিত্য জগতের অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে এবং আমাদের দেশে স্কুল কলেজে কবির চাইতে সমালোচকের

প্রাধান্য বেশি। কিন্তু তিনি মনে করেন, 'সমালোচনা যদি কবির কাব্যের রসাস্বাদনের অনুকূল না হয় তাহলে তা কাব্যের রসাস্বাদ করার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করে মাত্র।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ১৯০)

প্রমথ চৌধুরী ঐতিহাসিক সমালোচনায় বিশ্বাসী নন। কারণ কাব্যের আত্মা দেশ-কালের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। ঐতিহাসিক সমালোচনার ত্রুটি নির্দেশ করে তিনি বলেন, 'ঐতিহাসিক দার্শনিক সমালোচনার গলদ এই যে, কাব্যের আত্মা দেশকালের মধ্যে আবদ্ধ নয়, আর কাব্যরসিক মাত্রেই জানেন যে, কাব্য হচ্ছে ফিলসফির বহির্ভূত, কারণ মানবাত্মার যে মূর্তির সাক্ষাৎ কাব্যে পাওয়া যায়, তার সাক্ষাৎ দর্শনে মেলে না।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ১৯০) তা ছাড়া অলঙ্কারশাস্ত্র যেহেতু দর্শনশাস্ত্রের অংশ তাই কাব্য সমালোচককে হতে হয় দার্শনিক। তাঁর মতে, 'কাব্যসমালোচক মাত্রেই কতক অংশে ফিলসফার হতে বাধ্য।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ১৯১) কারণ কাব্য ম্যাজিক হতে পারে কিন্তু সমালোচনাকে অবশ্যই যৌক্তিক হতে হবে। কেননা সমালোচনার সম্পর্ক 'রিজনে'র সাথে।

সাহিত্যে শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রশ্নে প্রমথ চৌধুরী সুরুচির সমর্থক। অশ্লীলতাকে সংস্কৃত আলংকারিকদের প্রায় সবাই কাব্যের একটি স্পষ্ট দোষ বলে মনে করতেন। কেননা তা কাব্যের রূপ নষ্ট করে এবং রসপ্রতিপত্তিতে বিঘ্ন তৈরি করে। তাহলে প্রশ্ন জাগে – অশ্লীলতা কী? যে কথা শুনলে সভ্য ও সহৃদয় লোকদের মনে লজ্জা, ঘৃণা, অমঙ্গল ও জুগুপ্সার জন্ম দেয় তাই অশ্লীল। অশ্লীলতা বলতে আলংকারিক দণ্ডী বুঝতেন কাব্যের শব্দ ও অর্থের গ্রাম্যতাদোষকে (vulgar/indecent)। দণ্ডীর মতে, কাব্যে যখন কোনো কথা সোজাসুজিভাবে বলা হয় তখন কাব্য গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হয় আর বেঁকিয়ে চুরিয়ে বললে তা শুধু অগ্রাম্যই নয় রসাবহও হয়। বামনাচার্যের মতে, যে কথা শুধু জনসাধারণের মুখে শোনা যায় কিন্তু শাস্ত্রে যার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, সেই কথাই গ্রাম্য। এক্ষেত্রে প্রমথ চৌধুরীর সিদ্ধান্ত, 'শ্লীলতা অশ্লীলতা সুরুচির কথা সুনীতির নয়।' (প্রমথ, ১৯৮৯ : ২২৩) কেননা শ্লীলতা ও অশ্লীলতা পরিমাপের কষ্টিপাথর হচ্ছে কাব্যরসিক সমাজের রুচি। তিনি আরও বলেন, 'কাব্য সম্বন্ধে সুরুচি ও কুরুচি লোকের কাব্যজ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে, কোনরূপ বৈজ্ঞানিক দার্শনিক নৈতিক কিংবা সামাজিক মতামতের উপর নির্ভর করে না।' (প্রমথ, ১৯৮৯ : ২২৭) অপরদিকে সংস্কৃত আলংকারিকেরা কী বলা হলো তাতে বিচলিত হতেন না বরং কী করে বলা হলো তা-ই ছিলো তাঁদের কাছে বড়ো জিনিস। তাঁরা content-এর চাইতে form-কে বেশি মর্যাদা দিতেন। মানুষের নীতিবোধকে পীড়িত করে এমন উক্তিকে তাঁরা কাব্যে বর্জনীয় বলে মনে করতেন। অসদুপদেশও সে কালে কাব্যের দোষ বলেই গণ্য হতো। এ প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্য, 'কাব্য মীমাংসার ক্ষেত্রে তারা ছিলেন beauty-র অনুরক্ত, আমরা হয়েছি utility-র ভক্ত।' (প্রমথ, ১৯৮৯ : ২২৮)

প্রমথ চৌধুরীর মতে, সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার কথাটি সম্পূর্ণ নিরর্থক (প্রমথ, ১৯৮৯ : ২২৭)। কারণ সাহিত্যের স্বাস্থ্য জিনিসটা কী এবং কোন কোন বস্তুর সদ্‌ভাবের উপর তা নির্ভর করে, তার নির্ভুল হিসাব আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি। যাঁরা মুখে সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার কথা বলেন তাঁরা আসলে চান সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা। তাঁদের কাছে সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার অর্থ সমাজরক্ষা। এই কারণে তাঁদের কাছে কবির কথা অসহ্য; কারণ কবির কথা ভাবের কথা আর ভাবের স্পর্শই পারে মানুষের মনোভাব বদলে দিতে।

সমালোচনা সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মাথায় রেখে আমরা তাঁর সমালোচনা ভাবনার স্বরূপ বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হবো। এক্ষেত্রে আমরা প্রথমে বিশ্লেষণ করবো তাঁর রচিত 'জয়দেব' প্রবন্ধটি।

প্রমথ চৌধুরী এম.এ. ক্লাসের ছাত্র থাকা অবস্থায় সংস্কৃত ভাষার কবি জয়দেব প্রসঙ্গে 'জয়দেব' (১২৯৭) নামে একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ রচনা করেন। সাধু ভাষারীতিতে রচিত এই প্রবন্ধটিতে তিনি 'জয়দেবের কবি প্রতিভাকে খুব উচ্চে স্থান দেননি।' (রথীন্দ্রনাথ, ১৯৫৮ : ১৬৫) তিনি প্রবন্ধটিতে জয়দেবের তীব্রনিন্দা করেছেন। জয়দেবের সমালোচনায় তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন তার মধ্য দিয়ে আমরা তাঁর সমালোচক সত্তার কিছু পরিচয় পাই। যেমন :

সমালোচনার শুরুতে প্রমথ চৌধুরী সমালোচনার রীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন; অতঃপর নিজের অবলম্বিত পদ্ধতি, উক্ত পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা এবং সে বিষয়ে স্বীয় সিদ্ধান্ত নির্দেশ করে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। জয়দেব প্রবন্ধের শুরুতেই সাহিত্য সমালোচনার পদ্ধতি নির্দেশ করে তিনি বলেন –

> একখানি সাহিত্য গ্রন্থকে দুই রকমভাবে আলোচনা করা যায়; প্রথমত কাব্যস্বরূপে; দ্বিতীয়ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কারের উপায় স্বরূপে। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ১৭)

অতঃপর নিজের অবলম্বিত রীতি সম্পর্কে বলেন যে, কাব্য হিসেবেই তিনি জয়দেব রচিত *গীতগোবিন্দ* কাব্যটিকে বিচার করতে চান। ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কারের উপায় হিসেবে কেন বিচার করতে চান না, সে সম্পর্কে নিজের সীমাবদ্ধতাকে প্রকাশ করেন এই বলে যে, সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর ব্যুৎপত্তি নেই, *ভগবতগীতার* সাথে *গীতগোবিন্দ*'র কী সম্পর্ক তা তিনি জানেন না, তাছাড়া জয়দেবের গীতগোবিন্দের সময়ে ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিলো তাও তিনি জানেন না। তাই তিনি কাব্য হিসেবেই *গীতগোবিন্দকে* বিচার করতে চান। বিচারের সময় আমরা দেখব যে তিনি *গীতগোবিন্দ* কাব্যের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক নিয়ে মূল্যায়ন করছেন। এ বিষয়ে জীবেন্দ্র সিংহ রায়ের অভিমত :

> সাহিত্যের দু'টি দিক আছে – বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক। এই বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের মধ্যে কোনটিকে মুখ্য আর কোনটিকে গৌণ করে দেখেন নি প্রমথ চৌধুরী। বস্তুতঃ সাহিত্যকে তিনি একটি 'মানুষ' বলে মনে করতেন। আঙ্গিক তার 'দেহ', ভাব (বিষয়বস্তু) তার আত্মা। দেহকে বাদ দিয়ে আত্মার যেমন আত্মপ্রকাশ সম্ভব নয়, আবার তেমনি আত্মাকে বাদ দিয়ে দেহেরও আত্মরক্ষা অসম্ভব। আসলে একের অভাবে অপরে নিরর্থক। (জীবেন্দ্র,২০০২ : ৭১)

অনেকে *গীতগোবিন্দ* কাব্যে আধ্যাত্মিকতা ও প্রেম প্রত্যক্ষ করলেও তিনি তা করেননি। *গীতগোবিন্দ* কাব্যে নাকি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমবর্ণনাচ্ছলে জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার নিগূঢ় মিলনের বিষয়ই বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত–

> আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে এ কাব্যে আধ্যাত্মিকতার কোনো পরিচয় নাই। ... আমার কাছে কৃষ্ণ ও রাধাকে আমারই মতো রক্তে মাংসে গঠিত মানুষ বলিয়া বোধ হইয়াছে এবং তাঁহাদের প্রেমকেও স্ত্রী-পুরুষ ঘটিত সাধারণ মানবপ্রেম বলিয়াই বুঝিয়াছি। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ১৭)

এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বিবেচনায় রেখেই তিনি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ কাব্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন।

'সাহিত্যে সারল্য, স্বচ্ছতা, প্রাঞ্জলতা ও আলো প্রমথ চৌধুরীর আরাধ্য' (অরুণকুমার, ২০০৩ : ৮৬)। তাই সাহিত্যে বর্ণিত বিষয়ের পুনর্মূল্যায়নে তিনি আগ্রহী। *গীতগোবিন্দ* কাব্যে প্রেমের কথা বলা হলেও রাধা-কৃষ্ণ যে-ভাবে মত্ত সে-ভাবের নাম সংস্কৃতে প্রেম নয়। *গীতগোবিন্দ* কাব্যের প্রেমের স্বরূপ তিনি নির্ণয় করেছেন এভাবে –

> জয়দেব বর্ণিত প্রেমের উৎপত্তি দেহজ আকাঙ্ক্ষা হইতে, তাহার পরিণতি দেহের মিলনে, তাহার উদ্দেশ্য দেহের ভোগজনিত সুখলাভ, তাঁহার নিকট বিরহের অর্থ প্রণয়ী-প্রণয়িনীর দেহের বিচ্ছেদজনিত শারীরিক কষ্ট। গীতগোবিন্দে আসলে ধরিতে গেলে প্রেমের কথা নাই, কেবলমাত্র কামের বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ২০)

বিরুদ্ধবাদীরা অনেকেই বলতে পারেন যে, জয়দেব প্রেমের পরিবর্তে কামকেই তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু করেছেন যুগধর্মের সাথে সঙ্গতি রেখেই। কারণ জয়দেব যে সময়ের কবি, সে যুগে প্রেম ও কাম পরস্পর সম্পৃক্ত ছিলো। এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরীর অভিমত:

> যুগধর্ম প্রকাশ করাই সাহিত্যের চরম সাধনা, এ কথা সত্য নয়। তার কারণ, প্রথমত, যুগধর্ম বলে কোন যুগের একটিমাত্র বিশেষ ধর্ম নেই। একই যুগে নানা পরস্পর বিরোধী মতের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, মন-পদার্থটি কোনো বিশেষ

> কাল সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারে না। আত্মা এক অংশে কালের অধীন অপর অংশে মুক্ত ও স্বাধীন। কাব্য ধর্ম আর্ট প্রভৃতি মুক্ত আত্মারই লীলা। সুতরাং ইতিহাস এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, প্রতি যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে সমসাময়িক যুগধর্ম পরীক্ষিত এবং বিচারিত হয়েছে। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ৬৭)

তিনি আরও বলেন,

> নব যুগধর্ম আনয়ন করা যদি সাহিত্যের চরম সাধনা হয়, তা হলে সাহিত্য বর্তমান যুগধর্ম অতিক্রম করতে বাধ্য। যে আদর্শ সমাজে নেই, সে আদর্শের সাক্ষাৎ শুধু মনশ্চক্ষুতেই পাওয়া যায় এবং জীবনে নতুন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে হলে সমাজের দখলিস্বত্ববিশিষ্ট আদর্শের উচ্ছেদ করা দরকার। অর্থাৎ যুগধর্মের বিরোধী হওয়া আবশ্যক। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ৬৭)

আর এই নবযুগ বা 'নবজীবন যে লেখায় প্রতিফলিত হয় সেই লেখাই কেবল সাহিত্য – বাদবাকি লেখা কাজের নয়, বাজে।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ৪৪)

পুনর্মূল্যায়নের এই প্রবণতা আমরা *ভারতচন্দ্র* প্রবন্ধেও দেখতে পাবো। ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রচলিত প্রধান দোষ, সে কাব্য অশ্লীল। প্রমথ চৌধুরীর মতে,

> তাঁর গোটা কাব্য অশ্লীল না হোক, তার অনেক অংশ যে অশ্লীল সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। তা যে অশ্লীল তা স্বয়ং ভারতচন্দ্রও জানতেন, কারণ তাঁর কাব্যের অশ্লীল অঙ্গসকল তিনি নানাবিধ উপমা অলংকার ও সাধুভাষায় আবৃত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ২১৯)

কিন্তু এই অশ্লীলতা যে একমাত্র ভারতচন্দ্রের কাব্যের দোষ তা নয়। প্রাচীন যুগের কিংবা ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক প্রায় সকল কবির কাব্যই এই অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার যোগ্য। শুধু ভারতচন্দ্রকে এজন্যে অভিযুক্ত করা সমীচীন নয়। তাই তাঁর অভিমত: 'যে দোষে প্রাচীন কবিরা প্রায় সকলেই সমান দোষী, সে দোষের জন্যে একা ভারতচন্দ্রকে তিরস্কার করবার কারণ কি?' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ২১৯)

প্রমথ চৌধুরীর মতে, ভারতচন্দ্রকে তিরস্কারের 'প্রথম কারণ ভারতচন্দ্রের কাব্য যত সুপরিচিত, অপর কারো তত নয়। আর দ্বিতীয় কারণ, ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতর আর্ট আছে, অপরের আছে শুধু নেচার।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ২১৯) তাঁর বিবেচনায় ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রধান গুণ প্রসাদগুণ এবং তা রসাল। সে রস এ যুগে অস্পৃশ্য। ফলে ভারতচন্দ্রের কাব্য হয়ে পড়েছে অশ্লীল। পাশাপাশি ভারতচন্দ্রের লেখা সর্বসাধারণের কাছে সহজবোধ্য। তাঁর দৃষ্টিতে, 'ভারতচন্দ্রের কাব্যে প্রসাদগুণ যে অপূর্ব, এ সত্য এতই প্রত্যক্ষ যে, সে গুণ সম্বন্ধে কোন চক্ষুষ্মান বাঙালির পক্ষে অন্ধ হওয়া অসম্ভব।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ২১৮)

সাধারণ সমালোচকদের দৃষ্টিতে ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রধান রস আদিরস। কিন্তু প্রাবন্ধিকের মূল্যায়নে, 'ভারতচন্দ্রের সাহিত্যের প্রধান রস কিন্তু আদিরস নয়, হাস্যরস। এ রস মধুর রস নয়, কারণ এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয়, মস্তিষ্ক, জীবন নয়, মন। ... এ হাসি হচ্ছে সামাজিক জড়তার প্রতি প্রাণের বক্রোক্তি, মিথ্যার প্রতি সত্যের বক্রদৃষ্টি।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ২১৯-২০)

কাব্যবিচারে প্রমথ চৌধুরী কাব্যদেহের বাহ্যিক অঙ্গের সৌন্দর্যসন্ধানী। যে কবিতায় দেহের সৌন্দর্য নেই, তার যে আত্মার ঐশ্বর্য আছে, তিনি তা স্বীকার করেন না। তাঁর দৃষ্টিতে শারীরিক সৌন্দর্য তিনটি বিভিন্ন উপকরণে গঠিত। সেগুলো হলো : অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির গঠন বা আকৃতি, বর্ণ ও ভাব। যে কাব্যে নায়িকার সৌন্দর্য বর্ণনায় এই তিনটি বিষয়ের উত্তম রূপায়ণ ঘটে সেই কাব্যটি হয় শিল্পোত্তীর্ণ। কিন্তু জয়দেব কাব্যে নায়িকার শারীরিক কোমলতা ও স্পর্শযোগ্যতার বর্ণনা ব্যাপকভাবে করেছেন আর মুখের সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন দু-একটি বাক্যে। সৌন্দর্য সম্বন্ধে জয়দেবের এই প্রবণতার পরিচয় দিয়ে তিনি বলেন –

> জয়দেবের নিকট আমরা আকৃতি ও সৌন্দর্য অপেক্ষা শারীরিক কোমলতা ও স্পর্শযোগ্যতার ইত্যাদির অধিক বর্ণনা করিতে পারি এবং জয়দেব এ বিষয়ে আমাদের নিরাশ করেন না। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ২০)

কাব্যে স্ত্রী-পুরুষের রূপবর্ণনাতেও জয়দেব অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। দুই-একটি কথায় নারী-পুরুষের সমগ্র চিত্র বর্ণনা করতে তিনি নিতান্তই অপারগ। তাঁর হয়তো বিশ্বাস পদ্মের ন্যায় মুখ, তিলফুলের মতো নাক, ইন্দীবরের মতো চোখ এবং বান্ধুলীর মতো অধর – এই সবের একটি যোগ করলেই সুন্দরীর মুখাবয়ব নির্মাণ করা যায়।

প্রমথ চৌধুরী কাব্যের ভাব অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী। কারণ ভাব হচ্ছে কাব্যের আত্মা এবং ভাষা তার দেহ। কাব্যের দেহ থেকে আত্মা পৃথক করা অসম্ভব। তিনি মনে করেন ভাব মন্দ হলে কবিতার ভাষা কখনোই সুন্দর হতে পারে না। আবার ভাষা কদর্য হলে ভাবও সম্পূর্ণরূপে কবিত্বপূর্ণ হতে পারে না। অর্থাৎ কবিতার ভাষা ভাবের দেহস্বরূপ, তা কিছুতেই ভাব হতে পৃথক হতে পারে না। তবে শুধু ভাব অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করলেই হয় না, ক্ষেত্র বিশেষে ভাষার ন্যায় ভাবও রচনা করতে হয়। তিনি জয়দেবের কাব্যে ভাষাব্যবহারে অভিনবত্ব বা পাণ্ডিত্য লক্ষ করেননি। তাঁর দৃষ্টিতে জয়দেবের ভাষার প্রধান দোষ সুস্পষ্ট Rhythm-এর অভাব। জয়দেবের ব্যবহৃত শব্দগুলো প্রায় সম্পূর্ণরূপে একটি আরেকটির ন্যায়। অতিরিক্ত মাত্রায় অ-কারান্ত শব্দের ব্যবহারের কারণে এবং হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের প্রভেদ যথেষ্ট না থাকায় জয়দেবের ভাষায় গাম্ভীর্যের একান্ত অভাব ঘটেছে বলে তিনি মনে করেন। এর কারণ নির্দেশ করে তিনি বলেছেন –

> যখন রূপসীদিগের কবরী শিথিল হইয়া যাইতেছে, নীবিবন্ধন খসিয়া পড়িতেছে, যখন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির বন্ধন শ্লথ হইয়া আসিতেছে তখন আর ভাষার বাঁধুনি কি করিয়া প্রত্যাশা করা যায়? রাধার দেহের ন্যায় গীতগোবিন্দের ভাষা নিঃসহনিপতিতা লতাস্বরূপ। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ২৯)

তবে শুধু ব্যর্থতাই নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভাব অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারে কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় জয়দেবের প্রশংসাও করেছেন প্রমথ চৌধুরী। জয়দেবের ভাষা অতি সুললিত ও শ্রুতিমধুর। জয়দেবের রচনায় কিছু অতিরিক্ত মাত্রার কথার কারিগরিও দেখা যায়। তাঁর ভাষায় –

> শৃঙ্গার রসের বর্ণনাকালে তাঁহার ভাষা ভাবের অনুরূপ। তিনি শৃঙ্গার রসের কবি, কিন্তু যে রসেরই হউন না কেন, কবি তো বটে। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ২৯)

কাব্যের বিষয়নির্বাচনে, বিরহবর্ণনায়, অভিসারবর্ণনায় ও বসন্তবর্ণনায় প্রমথ চৌধুরী উৎকৃষ্টরুচি, বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব প্রত্যাশী। *গীতগোবিন্দ* কাব্যের বিষয় নির্বাচনে জয়দেব উৎকৃষ্ট রুচির পরিচয় দিতে পারেননি বলে তিনি মনে করেন। তাঁর অভিমত স্মর্তব্য –

> জয়দেব অধিকাংশ কবিদিগের অপেক্ষা কাব্যের বিষয়নির্বাচনে নিজের নিকৃষ্ট রুচির পরিচয় দিয়েছেন; প্রেমের পরিবর্তে শৃঙ্গার রসকে বর্ণিত বিষয়রূপে স্থির করিয়াছেন। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ২৩)

জয়দেবের বিরহবর্ণনায় তিনি বৈচিত্র্য কিংবা সজীবতা কিছুই প্রত্যক্ষ করেননি। জয়দেবের বিরহবর্ণনা তাঁর কাছে একঘেয়ে বলে মনে হয়েছে –

> জয়দেবের বিরহাদি বর্ণনা নেহাত একঘেয়ে। ... জয়দেব বিরহের ভাবের অন্য কোন অংশ ধরিতে পারেন নাই। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ২৪)

এছাড়া বিরহাবস্থার মধ্যে যে মধুর সৌন্দর্য আছে, সে-সৌন্দর্যবোধের অনুপস্থিতি রয়েছে জয়দেবের বিরহবর্ণনায়। তাঁর মতে, জয়দেবের অভিসারবর্ণনায় কেবল বেশভূষার বর্ণনাই রয়েছে, অভিসারিকার মনের আবেগ ও উৎকণ্ঠা নেই।

জয়দেবের বসন্তবর্ণনায় তিনি একেবারেই গতানুগতিক; এবং পূর্ববর্তী কবিদের অনুকরণ ছাড়া কোনো নতুনত্ব প্রত্যক্ষ করা যায় না। জয়দেবের বসন্তবর্ণনায় বসন্তের সমগ্রভাব ফুটে ওঠেনি; বিশেষ কোনো ভাব স্পষ্ট রূপে দেখা যায়নি। জয়দেবের সম্ভবত উদ্দেশ্য ছিল বসন্তে যে মদন-রাজার অধিকার বিস্তৃত হয়েছে তারই বর্ণনা করা। তাঁর ভাষায় –

> তাঁহার বসন্তবর্ণনার প্রধান দোষ তাহাতে একটিও সম্পূর্ণ নতুন কথা দেখিতে পাই না। পূর্ববর্তী কবিরা যে সকল বসন্তবর্ণনা লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই তাঁহার বসন্তবর্ণনার প্রধান উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ২৪)

কাব্যে উপমা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও প্রমথ চৌধুরী নতুনত্ব, অবিনবত্ব ও মৌলিকতা প্রত্যাশী। *গীতগোবিন্দ* কাব্যের উপমায় তিনি এগুলো প্রত্যক্ষ করেননি। তাঁর ভাষায় –

> জয়দেবের উপমাসকল প্রায়ই নেহাত পড়ে পাওয়া গোছের। জয়দেবের পূর্বে সে সকল উপমা শতসহস্রবার সংস্কৃত কবিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। ... জয়দেব অনেক স্থলেই পরের উপমাদি লইয়া তাহার একটু আধটু বদলাইয়া নিজের বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ২৫-২৬)

পাশাপাশি জয়দেব-পরিকল্পিত কয়েকটি নতুন উপমায় তিনি নানা রকম দোষ ও অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছেন। জয়দেবীয় উপমাগুলোকে তাঁর কাছে অপ্রাকৃত ও অর্থশূন্য বলে মনে হয়েছে। কাব্যে উপমা প্রয়োগ সম্পর্কে জয়দেবের দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে –

> জয়দেব কেবল উপমা প্রয়োগ করাটা কবিতায় আবশ্যক বিবেচনায় উক্ত কার্য করিতেছেন, বাস্তবিক উপমায় কবিতার সৌন্দর্য বাড়িল কি না এবং কোন বিশেষ ভাব পরিষ্কার রূপে তাহার সাহায্যে ব্যক্ত করা গেল কি না এ-সব কথা জয়দেবের মনেও আসে নাই। উপমা আপনা হতেই তাহার কাছে আসে না, তিনি জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া আনেন অর্থাৎ তাঁহার উপমায় স্বাভাবিকতা কিছু নাই। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ২৫-২৭)

অর্থাৎ জয়দেব-পরিকল্পিত উপমাগুলোতে স্বাভাবিকতা এবং মনের ছাপ নেই, আর 'যে লেখায় লেখকের মনের ছাপ নেই তা ছাপালে সাহিত্য হয় না।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ৪৫) তিনি আরও বলেন,

> এ কথা সত্য যে, মানবজীবনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই, তা সাহিত্য নয়, তা শুধু বাক্-ছল। জীবন অবলম্বন করেই সাহিত্য জন্ম ও পুষ্টি লাভ করে, কিন্তু সে জীবন মানুষের দৈনিক জীবন নয়। সাহিত্য হাতে হাতে মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করে দিতে পারে না। কোনো কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কিন্তু কোনো কোনো কথায় মন ভেজে; এবং সেই জাতির কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ৪২)

সাহিত্য সমালোচনায় প্রমথ চৌধুরী শৈল্পিকনিরাসক্তি বজায় রাখার পক্ষপাতী। জয়দেব প্রবন্ধে দেখা যায় তিনি জয়দেবের কাব্যের দোষ-গুণ বিচারের পাশাপাশি জয়দেবের জনপ্রিয়তার কারণও নির্দেশ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে, জয়দেবের জনপ্রিয়তার কারণ তিনটি। প্রথমত সুরতনুখালাস বর্ণনার উপযুক্ত ভাষা। যেখানে রয়েছে শৃঙ্গার রসের বর্ণনার স্বাভাবিকতা; রোমাঞ্চ, শীৎকার ইত্যাদি শারীরিক ভাবের বর্ণনা; যুবতীদের দেহের ন্যায় কুসুমসুকুমার শব্দের ব্যবহার। দ্বিতীয়ত সাধারণ

পাঠকের সংস্কৃত পাঠের অজ্ঞতা। তৃতীয়ত রাধা-কৃষ্ণের প্রেমসম্পর্কিত লোকায়ত অভ্যাস ও সংস্কার।

জয়দেবকে প্রথম শ্রেণির কবি হিসেবে স্বীকার না করলেও তিনি শৈল্পিক নিরাসক্তি বজায় রেখে জয়দেবের সমালোচনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি জয়দেবকে কেন উৎকৃষ্ট কবি বলতে প্রস্তুত নন তার কারণ নির্দেশ করে বলেছেন –

> যাঁহার কাব্যের বিষয় প্রেমের তামসিক ভাব, মানবদেহের সৌন্দর্য যাঁহার দৃষ্টিতে ততটা পড়ে না, যিনি মানবদেহকে কেবল ভোগের বিষয় বলিয়াই মনে করেন, প্রকৃতির সৌন্দর্যের সহিত যাঁহার সাক্ষাৎপরিচয় নাই, যিনি বর্ণনা করিতে হইলেই শোনা কথা আওড়ান, যাঁহার ভাষায় কবিত্ব অপেক্ষা চাতুরী অধিক – যাঁহার কাব্যে স্বাভাবিকতা অপেক্ষা কৃত্রিমতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাঁহাকে আমি উৎকৃষ্ট কবি বলিতে প্রস্তুত নহি। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ২৯)

বক্তব্য ও স্টাইল দুদিক থেকেই প্রমথ চৌধুরীর সমালোচক সত্তার বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে *জয়দেব* প্রবন্ধে। প্রবন্ধটিতে পূর্বাপর একটি শ্লেষাত্মক সুরও লক্ষণীয়। পরবর্তীকালে তাঁর প্রবন্ধে এই ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও শ্লেষাত্মক সুর আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। জয়দেবের বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ তুলেছেন যে ভাষায়, সে ভাষা নির্মম ও কঠিন। তিনি চিরকাল ভাষার ক্লাসিক্যাল বাঁধুনির পক্ষপাতী। ভাষার অসংযম ও শৈথিল্য তাঁর কাছে অমার্জনীয় অপরাধ। একারণে তাঁর সমালোচনার ভাষায় থাকে 'শ্লেষ, বিষম ও বিরোধাভাস, বক্রোক্তি ও ব্যাজোক্তি অলংকারের তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্রের খোঁচা'। (অরুণকুমার, ২০০৩ : ৮১)

'চিত্রাঙ্গদা' (চৈত্র ১৩৩৪) প্রবন্ধটিও প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য সমালোচনামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের মতে, 'তাঁর শিল্প জিজ্ঞাসার শ্রেষ্ঠ পরিচয় রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্যের সমালোচনা।' (অরুণকুমার, ২০০৩ : ১১৫) রথীন্দ্রনাথ রায়ের মতে, 'তাঁর সমুন্নত রসবোধের একটি মূল্যবান উদাহরণ চিত্রাঙ্গদা সমালোচনাটি।' (রথীন্দ্রনাথ, ১৯৫৮ : ২১০) অধীর দে-র মতে, 'এই প্রবন্ধে তাঁহার সুগভীর কাব্যানুভূতি ও বিচারধর্মী সূক্ষ্ম রসদৃষ্টির পরিচয় সম্যকভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।' (অধীর, ১৪০৬ : ১০১)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'কাব্যের নীতি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনেন এবং পরবর্তীকালে টমসন সাহেবও 'চিত্রাঙ্গদা'র দোষ-গুণ বিচার করে নাট্যকাব্যটির বিরুদ্ধে অনৈতিকতার অভিযোগ তোলেন। টমসনের মতে, রবীন্দ্রনাথের *চিত্রাঙ্গদা* একটি দুর্নীতিমূলক কাব্য এবং এই কাব্যে নারীজাতি সম্পর্কে কবির যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা অতীব অশ্রদ্ধেয়। প্রমথ চৌধুরীর 'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধটি মূলত টমসনের সমালোচনার দোষ-গুণ বিচারের উদ্দেশ্যে রচিত। এখানে তিনি টমসনের অভিযোগকে অস্বীকার করে অত্যন্ত

সংযতভাবে অথচ যুক্তিসহকারে *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যের সৌন্দর্য ও ভাবৈশ্বর্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর এই প্রয়াস অনেকটা আদালতের আইনজীবীদের বিতর্কের মতো। শুধু এই প্রবন্ধই নয়, তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধই বিতর্কমূলক এবং অন্যের অভিমতের প্রতিক্রিয়ায় লেখা। সমালোচকের মতে,

> প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধের অনেকগুলি এইরকম বিতর্কমূলক। কোনো প্রাচীন কি নবীন প্রচলিত ও প্রচারিত মতকে পরীক্ষা ক'রে প্রায়ই তার উচ্ছেদ করা এদের লক্ষ্য। এ পরীক্ষায় যুক্তি ও তর্কের অনেক বিচার, দেশী ও বিদেশী তথ্য ও তত্ত্বের বহু আলোচনা। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ১২)

প্রবন্ধটি পাঠ করলে দেখা যায় প্রমথ চৌধুরী সমালোচনার শুরুতে দীর্ঘ প্রারম্ভিক ভূমিকা বা কৈফিয়ত দিয়েছেন। এই সুদীর্ঘ ভূমিকাংশটি তাঁর সমালোচনার বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করে। ভূমিকায় তিনি নানা কথার বহু বাঁকা পথ পেরিয়ে, ছোট-বড় অনেক গলি ঘুরিয়ে পাঠককে মূল বক্তব্যের মুখোমুখি করেন। এই প্রক্রিয়ায় দুটি বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমটি সমালোচনার শ্রেণিবিভাগ; অপরটি কাব্যবিচারের মানদণ্ড। চিত্রাঙ্গদা প্রবন্ধে দেখা যায় যে, তিনি শুরুতেই দীর্ঘ ভূমিকা দিয়েছেন এবং সেখানে কবিতা ও দর্শন, কবি ও দার্শনিক, দার্শনিক সমালোচক, পক্ষপাতদুষ্ট সমালোচক, বিচারক সমালোচক, সমালোচনা বিষয়ে নিজের অভিমত, কবিত্বশক্তি, কাব্যের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

প্রমথ চৌধুরীর মতে, আমাদের সমাজে কাব্যসমালোচক দুই ধরনের। এর মধ্যে প্রথম ধরনের সমালোচকদের সমালোচনার সঙ্গে 'রিজনে'র কোন সম্পর্ক নেই। এ জাতীয় সমালোচনা ষোলো আনা 'আনরিজনে'র ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ জাতীয় সমালোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো কাব্যবিশেষের নিন্দা কিংবা প্রশংসা করা। এই নিন্দা-প্রশংসার মূল হচ্ছে রাগ-দ্বেষ এবং এর উৎস হচ্ছে হৃদয়। আলংকারিকেরা যে হৃদয়ের কথা বলেছেন এ সেই হৃদয় নয়, এ হচ্ছে রক্ত মাংসে গড়া সেই হৃদয় যা প্রাণী মাত্রেরই বুকের ভেতর দিনরাত ধড়ফড় করছে। কোনো কারণে কবির ওপর সমালোচক বিরক্ত হলে সমালোচনা নিন্দামূলক হয় আর সন্তুষ্ট হলে সমালোচনা প্রশংসামূলক হয়। অপর শ্রেণির সমালোচকেরা হচ্ছেন কাব্যের বিচারক। এঁরা হচ্ছেন কাব্যজগতের ধর্মাধিকরণের দল। কোন কবি কাব্যে কোন বিধি পালন করেছেন ও কোন বিধি অমান্য করেছেন, সেই অনুসারেই এঁরা কাব্যের সপক্ষে বা বিপক্ষে রায় দেন। তবে প্রমথ চৌধুরী কাব্যজগতের এ ধরনের নিয়মের অস্তিত্ব মানেন না। তাঁর দৃষ্টিতে, 'কাব্যেরও অবশ্য law আছে, কিন্তু প্রতি যথার্থ কবিই হচ্ছেন তার rules এর স্রষ্টা।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ১৯২) তাছাড়া কাব্য আমাদের সব প্রচেষ্টায় সহায় কি অন্তরায়, শিক্ষামূলক নাকি আনন্দমূলক সেই হিসেব অনুযায়ী কাব্যের মূল্য নির্ধারণ করার প্রবৃত্তি থেকে আমাদের সরে আসা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

সমালোচনার সময় প্রমথ চৌধুরী সংস্কৃত আলংকারিকদের অভিমত উদ্ধৃত করেন। এর কারণ এই নয় যে তিনি তাঁদের কথাকে চূড়ান্ত বলে বিশ্বাস করেন বা তাঁদের মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। এর কারণ :

> আমি বাংলা ভাষায় কথা কই। আর সংস্কৃত কথা বাংলা ভাষার মধ্যে যত সহজে বেমালুম খাপ খায়, গ্রীক ও জর্মান কথা তত সহজে ... বেখাপ্পা হয়। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ১৯৩)

সমালোচনায় ও সাহিত্যে শব্দব্যবহার সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর অভিমত, 'শব্দ গৌরবে সংস্কৃত ভাষা অতুলনীয়। কিন্তু তাই বলে তার ধ্বনিতে মুগ্ধ হয়ে আমরা যে শুধু তার সাহায্যে বাংলা সাহিত্যে ফাঁকা আওয়াজ করব তাও ঠিক নয়।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ৪৪৭) তিনি আরও বলেন,

> একেবারে বেপরোয়া ভাবে সংস্কৃত শব্দের অতিরিক্ত ব্যবহারের আমি পক্ষপাতী নই। তাতে মনোভাবও স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা যায় না, এবং ভাষাও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ৪৪৬)

তিনি সমালোচনায় ও সাহিত্যে 'খাঁটি বাংলা ভাষার পক্ষপাতী, কারণ সে ভাষা কংক্রিট শব্দবহুল।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ৮৬)

চিত্রাঙ্গদার সমালোচনার শুরুতে প্রমথ চৌধুরী পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় কবি রবীন্দ্রনাথকে 'কবি ও মহাকবি' হিসেবে মেনে নিয়েছেন এবং *চিত্রাঙ্গদার* রসমূল্য বিচার করতে গিয়ে রোমান্টিক কবিপ্রতিভার সৃজন প্রক্রিয়ার স্বরূপের কথা বলেছেন। অযথা বাগ্‌বিস্তার না করে তিনি সূত্রাকারে কবি হৃদয়ের অভিপ্রায়টিকে চিহ্নিত করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত,'চিত্রাঙ্গদা একটি স্বপ্নমাত্র, মানবমনের একটি অনিন্দ্য সুন্দর জাগ্রত স্বপ্ন।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ১৯৬) তিনি আরও বলেন,'রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্য মানুষের যৌবন স্বপ্নের একটি অপূর্ব এবং সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ১৯৭)

সাহিত্য সমালোচনায় প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যের বহিরঙ্গের সৌন্দর্যসন্ধানী। কারণ কোনো কাব্যের আত্মার পরিচয় দেওয়ার চাইতে তার দেহের পরিচয় দেওয়াটা অতিশয় সহজ, কেননা দেহ জিনিসটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আর ভাষা হচ্ছে ভাবের দেহ। এ কারণে তিনি *চিত্রাঙ্গদার* ভাষার সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য ও অলংকার ব্যবহারে কবির নৈপুণ্যের বিচার করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে চিত্র, সঙ্গীত ও কাব্যের অপূর্ব সমন্বয়ে চিত্রাঙ্গদা একটি সম্পূর্ণ রাগিণী। এর কোথাও একটি বেসুরো কথা নেই। এর ভাষার গতি যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি সাবলীল। এ কাব্যের অন্তরে বেসুরো কথা বা উচ্ছৃঙ্খল শব্দ নেই। কাব্যের ধ্বনি মুহূর্তের জন্যেও বাণীকে কোথাও ছাপিয়ে যায়নি। এর ভাষা যেমন

সংযতভাবে অথচ যুক্তিসহকারে *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যের সৌন্দর্য ও ভাবৈশ্বর্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর এই প্রয়াস অনেকটা আদালতের আইনজীবীদের বিতর্কের মতো। শুধু এই প্রবন্ধই নয়, তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধই বিতর্কমূলক এবং অন্যের অভিমতের প্রতিক্রিয়ায় লেখা। সমালোচকের মতে,

> প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রবন্ধের অনেকগুলি এইরকম বিতর্কমূলক। কোনো প্রাচীন কি নবীন প্রচলিত ও প্রচারিত মতকে পরীক্ষা ক'রে প্রায়ই তার উচ্ছেদ করা এদের লক্ষ্য। এ পরীক্ষায় যুক্তি ও তর্কের অনেক বিচার, দেশী ও বিদেশী তথ্য ও তত্ত্বের বহু আলোচনা। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ১২)

প্রবন্ধটি পাঠ করলে দেখা যায় প্রমথ চৌধুরী সমালোচনার শুরুতে দীর্ঘ প্রারম্ভিক ভূমিকা বা কৈফিয়ত দিয়েছেন। এই সুদীর্ঘ ভূমিকাংশটি তাঁর সমালোচনার বৈশিষ্ট্যকে সূচিত করে। ভূমিকায় তিনি নানা কথার বহু বাঁকা পথ পেরিয়ে, ছোট-বড় অনেক গলি ঘুরিয়ে পাঠককে মূল বক্তব্যের মুখোমুখি করেন। এই প্রক্রিয়ায় দুটি বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমটি সমালোচনার শ্রেণিবিভাগ; অপরটি কাব্যবিচারের মানদণ্ড। চিত্রাঙ্গদা প্রবন্ধে দেখা যায় যে, তিনি শুরুতেই দীর্ঘ ভূমিকা দিয়েছেন এবং সেখানে কবিতা ও দর্শন, কবি ও দার্শনিক, দার্শনিক সমালোচক, পক্ষপাতদুষ্ট সমালোচক, বিচারক সমালোচক, সমালোচনা বিষয়ে নিজের অভিমত, কবিত্বশক্তি, কাব্যের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

প্রমথ চৌধুরীর মতে, আমাদের সমাজে কাব্যসমালোচক দুই ধরনের। এর মধ্যে প্রথম ধরনের সমালোচকদের সমালোচনার সঙ্গে 'রিজনে'র কোন সম্পর্ক নেই। এ জাতীয় সমালোচনা ষোলো আনা 'আনরিজনে'র ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ জাতীয় সমালোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো কাব্যবিশেষের নিন্দা কিংবা প্রশংসা করা। এই নিন্দা-প্রশংসার মূল হচ্ছে রাগ-দ্বেষ এবং এর উৎস হচ্ছে হৃদয়। আলংকারিকেরা যে হৃদয়ের কথা বলেছেন এ সেই হৃদয় নয়, এ হচ্ছে রক্ত মাংসে গড়া সেই হৃদয় যা প্রাণী মাত্রেরই বুকের ভেতর দিনরাত ধড়ফড় করছে। কোনো কারণে কবির ওপর সমালোচক বিরক্ত হলে সমালোচনা নিন্দামূলক হয় আর সন্তুষ্ট হলে সমালোচনা প্রশংসামূলক হয়। অপর শ্রেণির সমালোচকেরা হচ্ছেন কাব্যের বিচারক। এঁরা হচ্ছেন কাব্যজগতের ধর্মাধিকরণের দল। কোন কবি কাব্যে কোন বিধি পালন করেছেন ও কোন বিধি অমান্য করেছেন, সেই অনুসারেই এঁরা কাব্যের সপক্ষে বা বিপক্ষে রায় দেন। তবে প্রমথ চৌধুরী কাব্যজগতের এ ধরনের নিয়মের অস্তিত্ব মানেন না। তাঁর দৃষ্টিতে, 'কাব্যেরও অবশ্য law আছে, কিন্তু প্রতি যথার্থ কবিই হচ্ছেন তার rules এর স্রষ্টা।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ১৯২) তাছাড়া কাব্য আমাদের সব প্রচেষ্টায় সহায় কি অন্তরায়, শিক্ষামূলক নাকি আনন্দমূলক সেই হিসেব অনুযায়ী কাব্যের মূল্য নির্ধারণ করার প্রবৃত্তি থেকে আমাদের সরে আসা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

সমালোচনার সময় প্রমথ চৌধুরী সংস্কৃত আলংকারিকদের অভিমত উদ্ধৃত করেন। এর কারণ এই নয় যে তিনি তাঁদের কথাকে চূড়ান্ত বলে বিশ্বাস করেন বা তাঁদের মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। এর কারণ :

> আমি বাংলা ভাষায় কথা কই। আর সংস্কৃত কথা বাংলা ভাষার মধ্যে যত সহজে বেমালুম খাপ খায়, গ্রীক ও জর্মান কথা তত সহজে ... বেখাপ্পা হয়। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ১৯৩)

সমালোচনায় ও সাহিত্যে শব্দব্যবহার সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর অভিমত, 'শব্দ গৌরবে সংস্কৃত ভাষা অতুলনীয়। কিন্তু তাই বলে তার ধ্বনিতে মুগ্ধ হয়ে আমরা যে শুধু তার সাহায্যে বাংলা সাহিত্যে ফাঁকা আওয়াজ করব তাও ঠিক নয়।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ৪৪৭) তিনি আরও বলেন,

> একেবারে বেপরোয়া ভাবে সংস্কৃত শব্দের অতিরিক্ত ব্যবহারের আমি পক্ষপাতী নই। তাতে মনোভাবও স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা যায় না, এবং ভাষাও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ৪৪৬)

তিনি সমালোচনায় ও সাহিত্যে 'খাঁটি বাংলা ভাষার পক্ষপাতী, কারণ সে ভাষা কংক্রিট শব্দবহুল।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ৮৬)

চিত্রাঙ্গদার সমালোচনার শুরুতে প্রমথ চৌধুরী পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় কবি রবীন্দ্রনাথকে 'কবি ও মহাকবি' হিসেবে মেনে নিয়েছেন এবং *চিত্রাঙ্গদার* রসমূল্য বিচার করতে গিয়ে রোমান্টিক কবিপ্রতিভার সৃজন প্রক্রিয়ার স্বরূপের কথা বলেছেন। অযথা বাগ্‌বিস্তার না করে তিনি সূত্রাকারে কবি হৃদয়ের অভিপ্রায়টিকে চিহ্নিত করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর অভিমত,'চিত্রাঙ্গদা একটি স্বপ্নমাত্র, মানবমনের একটি অনিন্দ্য সুন্দর জাগ্রত স্বপ্ন।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ১৯৬) তিনি আরও বলেন,'রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা কাব্য মানুষের যৌবন স্বপ্নের একটি অপূর্ব এবং সর্বাঙ্গসুন্দর চিত্র।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ১৯৭)

সাহিত্য সমালোচনায় প্রমথ চৌধুরী সাহিত্যের বহিরঙ্গের সৌন্দর্যসন্ধানী। কারণ কোনো কাব্যের আত্মার পরিচয় দেওয়ার চাইতে তার দেহের পরিচয় দেওয়াটা অতিশয় সহজ, কেননা দেহ জিনিসটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আর ভাষা হচ্ছে ভাবের দেহ। এ কারণে তিনি *চিত্রাঙ্গদার* ভাষার সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য ও অলংকার ব্যবহারে কবির নৈপুণ্যের বিচার করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে চিত্র, সঙ্গীত ও কাব্যের অপূর্ব সমন্বয়ে চিত্রাঙ্গদা একটি সম্পূর্ণ রাগিণী। এর কোথাও একটি বেসুরো কথা নেই। এর ভাষার গতি যেমন স্বচ্ছন্দ তেমনি সাবলীল। এ কাব্যের অন্তরে বেসুরো কথা বা উচ্ছৃঙ্খল শব্দ নেই। কাব্যের ধ্বনি মুহূর্তের জন্যেও বাণীকে কোথাও ছাপিয়ে যায়নি। এর ভাষা যেমন

প্রসন্ন তেমনি সপ্রাণ, যেমন উচ্ছৃঙ্খল তেমনি স্নিগ্ধ। ভাষার সমতা ও মসৃণতার গুণে এ কাব্য মেঘদূত ও কুমারসম্ভবের স্বজাতীয় ও সমকক্ষ। *চিত্রাঙ্গদার* ভাষা সম্পর্কে তাঁর অভিমত :

> চিত্রাঙ্গদার ভাষা সেই জাতীয় জাদুকরী ভাষা, যার সাক্ষাৎ আমরা ইংরেজ কবি কীটসের কবিতায় পাই। এক কথায় এ হচ্ছে লৌকিক ভাষার অলৌকিক সংস্করণ। এ ভাষার মোহিনী শক্তির মূল হচ্ছে কবির আত্মায়। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ১৯৯-২০০)

ভাষা বিচার করতে গেলে প্রাসঙ্গিকভাবে অলংকারের প্রসঙ্গ আসে। অলংকারের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী চিত্রাঙ্গদা কাব্যে অনুপ্রাস, উপমা ও অতিশয়োক্তি অলংকার ব্যবহারে কবির নৈপুণ্য তুলে ধরেছেন। *চিত্রাঙ্গদার* অনুপ্রাস ও উপমা ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর অভিমত, 'চিত্রাঙ্গদা কাব্যের অনুপ্রাস ও উপমা উভয়ই কাব্যের অন্তরঙ্গ। এ কাব্যে এমন একটিও অনুপ্রাস কিংবা উপমা নেই যা এ কাব্যের অঙ্গে প্রক্ষিপ্ত এবং অন্তর থেকে উদ্ভূত নয়।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ২০১)

কবি যখন কবিপ্রতিভার বলে উপমান ও উপমেয়ের মধ্যকার সাদৃশ্যকে সাযুজ্যে পরিণত করেন তখন তাকে বলে অতিশয়োক্তি। চিত্রাঙ্গদা কাব্যে এমন অনেক অলংকার পাওয়া যাবে যারা তাদের গুণে বর্ণিত সব বিষয়ে লোকসীমা অতিক্রম করবে অর্থাৎ অতিশয়োক্তি অলংকারের গোত্রভুক্ত হবে। অতিশয়োক্তি অলংকার ব্যবহারে *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যের কবির সার্থকতাকে নির্দেশ করে তিনি বলেন, 'কবি মাত্রই অতিবাদী। আর এই 'অতি' শব্দের মর্ম যিনি গ্রহণ করতে পারেন তিনিই মর্মে মর্মে অনুভব করবেন যে চিত্রাঙ্গদার কবি চরম কবি।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ২০৩)

প্রমথ চৌধুরী কাব্যে রূপান্তরবাদের পক্ষপাতী। লৌকিক জগতে যাই হোক না কেন রসলোকে উত্তীর্ণ হলে অনৈতিক বিষয়কেও তিনি গ্রহণ করতে রাজি। তাই টমসন সাহেব যেখানে চিত্রাঙ্গদার বিষয়বস্তুকে Erotic এবং Immoral বলে মনে করেছেন; সেখানে প্রমথ চৌধুরী দেখিয়েছেন যে, এটি কাব্যরসোত্তীর্ণ। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত, 'কাব্যের আবেদন মানুষের Moral sense এর কাছে নয় Spiritual sense এর কাছে।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ২০৪) তাই সাহিত্যকে কোনো-একটি বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের উপায়স্বরূপ করে তুললে তাকে অনিবার্য ভাবেই সংকীর্ণ করে ফেলা হয়। কেননা –

> ন্যায়ের তর্কের সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ সার্থকতা নেই। অর্থহীন বস্তু কিংবা পদার্থহীন ভাব, এ দুয়ের কোনটাই সাহিত্যের যথার্থ উপাদান নয়। রিয়ালিজমের পুতুলনাচ এবং আইডিয়ালিজমের ভাববাজি উভয়ই কাব্যে অগ্রাহ্য। কাব্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ। এবং যেহেতু জীবে চিৎ এবং জড় মিলিত হয়েছে সে কারণে যা হয় বস্তুহীন নয় ভাবহীন তা কাব্য নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিমাত্রেই একাধারে রিয়ালিস্ট এবং

> আইডিয়ালিস্ট; কি বর্হিজগৎ কি মনোজগৎ দুয়ের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ৬৯)

চিত্রাঙ্গদা কাব্যকে Erotic কাব্য বলে যে অভিযোগ টমসন তুলেছিলেন, প্রমথ চৌধুরী তা খণ্ডন করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা যাকে প্রেম বলি তা মনোজগতের বস্তু হলেও যেমন দেহের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত নয় তেমনি মানবপ্রেম শুধু চিদাকাশের কুসুম নয়, দেহ ও মন উভয় জগৎ অধিকার করেই তা বিরাজ করে।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ২০৭) তিনি কাব্যটি সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন এভাবে :

> Erotic কাব্য বলে কোন বস্তু নেই, কেননা যে মুহূর্তে কবির কল্পনা কাব্য আকার ধারণ করে সেই মুহূর্তেই তা eroticism কে অতিক্রম করে। ... চিত্রাঙ্গদা একাধারে কাব্য, চিত্র ও সঙ্গীত, অতএব তা চরম কাব্য। কেননা চিত্রাঙ্গদায় আর্টের ত্রিধারার পূর্ণ মিলন হয়েছে। আর্ট হিসেবে চিত্রাঙ্গদার আর একটি মহাগুণ এর পরিমিত ও পরিচ্ছন্ন আয়তন। এর আস্থায়ী-অন্তরার পর যদি আভোগ-সঞ্চারী থাকত, অর্থাৎ এ স্বপ্ন যদি আরো বিস্তৃত হতো, তা হলে পাঠকের মন স্বপ্নলোক থেকে সুষুপ্তিলোকে চলে যেত। (প্রমথ, ১৯৮৬ : ২০৭)

চিত্রাঙ্গদা কাব্যের কবির 'স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ধারণা' বা attitude বিষয়ে টমসন অভিযোগ তুলে বলেছিলেন, এই কাব্যে কবির নারী সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি নাকি 'Woman exists for man's sake' এবং 'individual rights of woman'এ এই কবি বিশ্বাস করেন না। টমসন সাহেবের এই অভিমত খণ্ডন করে তিনি বলেছেন, 'Woman exists for man's sake কিংবা Man exists for woman's sake' কথা দুটি হাস্যকর এবং আংশিক সত্য। অধিকার কর্তব্য ইত্যাদি সামাজিক মানুষের কথা এবং প্রতিটি অধিকারের সঙ্গে অসংখ্য কর্তব্যের বন্ধন আছে। এছাড়া আমরা নারীকে পুরুষ করতে যেমন পারব না তেমনি পারব না তাকে নারীসুলভ প্রবৃত্তির বন্ধন থেকে মুক্ত করতে। তাই প্রাবন্ধিকের অভিমত: 'টমসন সাহেব যে সভ্যতার মুখপাত্র সে সভ্যতার বোধ হয় এই বিশ্বাস যে, স্ত্রীলোককে কোন রকমে দ্বিতীয় পুরুষ করতে পারলেই বিশ্বমানব উত্তম পুরুষ হয়ে উঠবে।' (প্রমথ, ১৯৮৬ : ২০৫)

প্রমথ চৌধুরীর এই প্রবন্ধটি বিষয়োচিত গাম্ভীর্য অনুযায়ী বীরবলী বাকচাতুর্য ও রস রসিকতায় লাবণ্যময় হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য অধীর দে-র মন্তব্য :

> গভীর সত্যানুসন্ধিৎসা ও নিরপেক্ষ নির্ভীক স্পষ্ট ভাষণ সাধারণত প্রথম শ্রেণির কলা-সমালোচকের স্বভাবগত ধর্ম এবং এই জাতীয় গুণাবলী দ্বারা যে প্রমথ চৌধুরীর মনন-চিন্তা সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, 'চিত্রাঙ্গদা' প্রবন্ধ হইতে তাহা সার্থকভাবে প্রমাণিত হয়। প্রমথ চৌধুরীর এই প্রবন্ধটির অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে বিষয়োচিত গাম্ভীর্য অনুযায়ী বীরবলী বাকচাতুর্য ও রস-রসিকতাও শিল্পদেহে বিচ্ছুরিত লাবণ্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। (অধীর, ১৪০৬ : ১০১)

প্রমথ চৌধুরী মননশীল প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য-সমালোচক। সংস্কারের অন্ধতা ও মোহের পিছুটান থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াস তাঁর রচনার সর্বত্র বর্তমান। তিনি সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র (sensual) না হলেও ইন্দ্রিয়বাদী (sensuous) হওয়ার সাধনা করেছেন। সাহিত্যিকের রূপজ্ঞানের আবশ্যকতার ওপর তিনি জোর দিয়েছেন। সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি, তাতে মনে হয় যে তিনি ইন্দ্রিয়বাদকে সমালোচনার মূলসূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং এটিকে শিল্পের রসাস্বাদনের একটা প্রধান উপায় ও উপাদান বলে স্বীকার করতে ইতঃস্তত করেননি। তিনি ছিলেন বিবর্তনপন্থী; সমস্ত রকমের জড়তা, স্থিরতা, শিথিলতা, নিশ্চেষ্টতার বিরোধী। সাহিত্যিক শুচিবাই তাঁর ছিল না এবং সামাজিক কারণে তিনি আদিরসকে উপেক্ষা করার মতো রক্ষণশীলও ছিলেন না। সুরুচিপন্থী ছিলেন বলেই আদিরস নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। তিনি মনে করতেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্য কাব্যে অবশ্যই থাকবে, কিন্তু তা যেন ভাবের সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রকাশ পায়। তিনি আর্টকে সবকিছুর ওপরে স্থান দিয়েছেন। সমালোচনাসূত্রে তিনি যা বলেছেন তার প্রধান কথা হচ্ছে মন ও সাহিত্যের মুক্তি। এই মুক্তি প্রাচীন ও নবীন সংস্কারের অন্ধতা থেকে মুক্তি, অর্থহীন বন্ধন থেকে মুক্তি, গতানুগতিকতা হতে মুক্তি, বুদ্ধির মুক্তি, ভাবালুতামুক্তি।

গ্রন্থপঞ্জি

অধীর দে, ১৪০৬। *বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারা*, উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ২০০৩। *বীরবল ও বাংলা সাহিত্য*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

কবীর চৌধুরী, ২০০৮। *সাহিত্য কোষ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

জীবেন্দ্র সিংহ রায়, ২০০২। *প্রমথ চৌধুরী*, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

প্রমথ চৌধুরী, ১৯৮৬। *প্রবন্ধ সংগ্রহ* (ভূমিকা অতুলচন্দ্র গুপ্ত), বিশ্বভারতী, কলিকাতা

বুদ্ধদেব বসু, ১৯৫৯। *কালের পুতুল*, নিউ এজ, কলিকাতা

রথীন্দ্রনাথ রায়, ১৯৫৮। *বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী*, ইষ্ট এণ্ড কোম্পানী, কলকাতা